বাংলাদেশের কৃষি:

কৃষির ব্যবসাবাদ বনাম ক্ষুদ্রকৃষকের জীবনজীবিকা

KHANI খানি
FOOD SECURITY NETWORK
BANGLADESH

actionaid

বাংলাদেশের কৃষি:

কৃষির ব্যবসাবাদ বনাম ক্ষুদ্রকৃষকের জীবনজীবিকা

বাংলাদেশের কৃষি:
কৃষির ব্যবসাবাদ বনাম ক্ষুদ্রকৃষকের জীবনজীবিকা

প্রকাশনা
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান
নোয়াখালী প্রেসক্লাব ভবন (এনেক্স বিল্ডিং)
মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।
ই-বার্তা: pranbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.pran.org.bd

প্রকাশ
আগস্ট ২০১৭

রচনা ও সম্পাদনা
নুরুল আলম মাসুদ

সহায়তা
খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি)
একশনএইড বাংলাদেশ

নকশা ও মুদ্রণ
রেডলাইন

নিঃস্বত্ত্ব
এই প্রকাশনাটি সৃজনী সাধারণ অবাণিজ্যিক লাইসেন্সের আওতায় প্রকাশিত। যে কোন অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যে কোন মাধ্যমে এই পুস্তিকাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। সূত্র উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ রইলো।

মুখবন্ধ

মানুষ সাধারণত তরুণ বয়সেই নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা শুরু করে; কোন পথে এগোনো উচিত সেটি নির্ধারণ করে এবং সে অনুযায়ী জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে। কিন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আগামীতে নিজেকে কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা-এটি কারো চিন্তার অংশ হয় না। কৃষক পরিচয় সামাজিকভাবে সম্মানজনক নয়, কৃষি কোন লাভজনক পেশা নয়, জমির মালিকানায় নিরাপত্তাহীনতা, দুর্বল গ্রামীণ অবকাঠামো এবং কৃষিতে করপোরেশনের আগ্রাসনের ফলে তরুণদের কাছে কৃষি আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে বিবেচিত হয় না।

বিশ্বে মোট যুব জনগোষ্ঠির শতকরা ৬০ ভাগের মতো বা ৭৫ কোটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং অর্ধেকের বেশি সরাসরি কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাবে জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনায় দেশের ২৪.৫ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। মোট দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে আর ১৮ শতাংশ শহরে বাস করে। যেহেতু গ্রামীণ মানুষের প্রায় ৮০ ভাগ সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং দেশের মোট দরিদ্রের ৮২ শতাংশ গ্রামে থাকে সেই হিসেবে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষক। ফলে গ্রামীণ পরিবারগুলো দারিদ্র্য অবস্থায় দীর্ঘ বসবাসের ফলে তরুণরা আগামীতে নিজেকে কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয় না।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং জীবনীশক্তি। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপের হিসাব মতে, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৭ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় উৎপাদনশীল ব্যক্তিখাত হিসেবে কৃষিখাত জিডিপিতে প্রায় ১৪.৭৫ শতাংশ অবদান রাখে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ তরুণ, যাদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩৫। আমাদের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৩৮.৫ ভাগ যুবা, আগামি দশকগুলোতে যুবাদের অংশগ্রহণ বেড়ে ৬০ শতাংশে

দাঁড়াবে এবং ধারা ২০৫০ সাল নাগাদ অব্যাহত থাকবে। তাই তরুণদের কৃষি, কৃষিরাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে তরুণদের আগ্রহী করে তোলা জরুরি। এছাড়া, যুবকরাই সমাজের এবং দেশের অর্থনীতিতে মূল ক্রিড়ানকের ভূমিকা পালন করে, এবং সমাজে সকল ধ্যান-ধারণা জনসমাজে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে তরুণরাই এগিয়ে আসে।

এই প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক (খানি) কৃষি বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে তরুণদের সাথে ধারাবাহিক আড্ডা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সকল আয়োজনে গ্রামীণ তরুণদের পাশাপাশি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করবেন। আমরা আশা করি এই আড্ডাগুলোর মধ্যদিয়ে তরুণরা কৃষি রাজনীতি-অর্থনীতি, নিজেদেরকে কৃষক-সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করা, নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও কৌশল বিনিময় করা এবং এ বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অ্যাডভোকেসি করার দক্ষতা অর্জন করবে।

উল্লেখিত বিষয়ে ধারণায়নের জন্য এই পুস্তিকাটি প্রণীত হচ্ছে। আশা করছি, পুস্তিকাটি থেকে তরুণরা কৃষির রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে একটি ধারণা পাবেন।

বাংলাদেশের কৃষি:

কৃষির ব্যবসাবাদ বনাম ক্ষুদ্রকৃষকের জীবনজীবিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং জীবনীশক্তি। দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন এবং তারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, বাংলাদেশের এখনো শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ গ্রামীণ মানুষের আয়ের উৎস কৃষি। দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামীণ পরিবার কৃষি ও অকৃষিজ উভয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল।[১] শহরে বসবাসকারীদের মধ্যেও ১১ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষিকাজে যুক্ত।[২] বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপের (২০১৩) হিসাব মতে, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৭ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় উৎপাদনশীল ব্যক্তিখাত হিসেবে কৃষিখাত জিডিপিতে প্রায় ১৪.৭৫ শতাংশ অবদান রাখে।[৩] সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ২০.০১ ভাগ, ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৯.৪২। কিন্তু, সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, গেল ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমে শতকরা ১৪.৭৫ ভাগে নেমে এসেছে। শতকরা হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনমূল্যে কৃষির অংশীদারিত্ব কমলে জাতীয় পরিসরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রে কৃষির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অর্থনীতিতে তিনটি বৃহৎ খাতের মধ্যে এখনো কৃষির অবদান তৃতীয়। কাজেই জিডিপিতে খাত হিসেবে কৃষির অবদান কমলেও কৃষিভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্যের হিসাব ধরলে জিডিপির প্রায় ৪৫ শতাংশ কৃষি থেকেই আসে।[৪] কৃষির বিকাশের মাধ্যমেই শিল্প ও সেবাখাত বিকশিত হয়েছে; গ্রামীণ এলাকার ভোক্তাদের বাজারের চাহিদাভিত্তিক মালামালের প্রধান উৎসও কৃষি। কৃষি সামাজিক কর্মকান্ডের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্ত:সম্পর্কিত ক্ষেত্র যা জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য।

সম্প্রতি জাতিসংঘ স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গ্রহণ

করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের ক্ষুধা নির্মূল করা, অপুষ্টি দূর করা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সব সম্পদে ক্ষুদ্র কৃষকদের ন্যায্য প্রবেশাধিকার দেয়া, কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য এসডিজিতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজির দ্বিতীয় লক্ষ্যে ক্ষুধার সমাপ্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নততর পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া লক্ষ্য ৩-এর আওতায় সবার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন, লক্ষ্য ৬-এর আওতায় পানীয় জলের সরবরাহ, লক্ষ্য ১০-এ আভ্যন্তরীণ অসমতা দূরীকরণ, লক্ষ্য ১২-তে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, লক্ষ্য ১৫-তে স্থলজ প্রতিবেশ ও বন সংরক্ষণ এবং লক্ষ্য ১৬-তে জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত লক্ষ্যগুলোর প্রতিটিই কৃষির ব্যবস্থার জোরদারকরণ, ক্ষুদ্র কৃষকদের অধিকার ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা, ক্ষুধামুক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র আলোকে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি রূপকল্প হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত-সহিষ্ণু টেকসই নিবিড় ও বহুমুখী কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যা গ্রামীণ নারী-পুরুষ ও জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে ভালোভাবে সমন্বিত থাকবে। আর সামগ্রিক লক্ষ্য ধরা হয়েছে, কৃষি উৎপাদন নিবিড় ও বহুমুখীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন। উদ্দেশ্যগুলো হলো চাহিদানির্ভর বিকেন্দ্রীকৃত গবেষণা ও সম্প্রসারণসেবা, ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারাবাহিকতা, উৎপাদনশীলতা ও গ্রামীণ কৃষি পরিবারের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের রফতানি, বাণিজ্যিক কৃষি, গবেষণা ও আধুনিক কৃষি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, ভূ-উপরিভাগের পানির ব্যবহার, নারীর অংশগ্রহণ, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও বজায় রাখা এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও ভোগের বহুমুখীকরণ। এ জন্য ৭ শতাংশ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিহার অভিমুখী ৪.৫ শতাংশ কৃষি প্রবৃদ্ধির জন্য কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিস্তার এবং সব উপখাতে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে। খাত নির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়নের নীতি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে- কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, রফতানিমুখীনতা, জলবায়ু পরিবর্তন-নগরায়ন-বিশ্বায়ন-প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বিষয়ক ক্রসকাটিং নীতিমালা, কৃষি প্রতিবেশ ব্যবস্থায় গুরুত্ব, পারিবারিক কৃষি, শিক্ষা-গবেষণা সম্প্রসারণ ও কৃষক সংশ্লিষ্টতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল হচ্ছে টেকসই কৃষি ও সবুজ প্রবৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, শস্য এলাকা ও ভূমি ব্যবহার, পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, কৃষির বহুমুখীকরণ, উন্নত কৃষিচর্চা প্রচলন, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন; প্রাণিসম্পদ খাতে জাত উন্নয়ন ও প্রাণির খাদ্য উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন; পুকুরে মাছ চাষ ও ব্রাকিশ ওয়াটার চিংড়ি চাষ, মুক্ত জলাশয়ের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও বন উজাড়ীকরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বনাঞ্চলের সম্প্রসারণ।[৫] বস্তুত কৃষি উৎপাদন নিবিড় ও বহুমুখী করার লক্ষ্য অর্জনে প্রযুক্তির ওপর মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার যে কৌশল সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নেওয়া হয়েছে তা একটি খন্ডিত ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। পুরো পরিকল্পনায় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি রয়েছে; শুধু উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধিই কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মাধ্যম হতে পারে না। অপরাপর নির্ধারক ও প্রভাবকগুলোর সঙ্গে প্রযুক্তি কীভাবে টেকসই সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে তা বিবেচনায় নিতে হবে।[৬]

দারিদ্র্য হ্রাসে কৃষির ভূমিকা

দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন [২০০৮] অনুসারে কৃষির উৎপাদন ১ শতাংশ বাড়লে দারিদ্র্যের হার ০.৫ শতাংশ হ্রাস পায়। অর্থনীতির অন্যান্য খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচনে দ্বিগুণ কার্যকর। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৩.১ শতাংশ হারে। এ সময় দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে বছরে গড়ে ১.৪ শতাংশ হারে।[৭] সম্প্রতি দেশে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কৃষি উৎপাদন ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্যের হার ০.৪১ শতাংশ হ্রাস পায়।[৮] কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধির তুলনায় দ্বিগুণ হারে দারিদ্র্য কমায়। কৃষিখাতে উৎপাদন বাড়লে খাদ্য ও পুষ্টির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যপণ্যের মূল্যে

স্থিতিশীলতা আসার ফলে তা দ্বিগুণ হারে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করে। কিন্তু, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কৃষিখাত তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। যে হারে মোট বাজেটের আকার বাড়ছে, কৃষি বাজেটের বরাদ্দ সেই হারে হচ্ছে না; ফলে তা কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস করছে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ সাল নাগাদ মোট বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬১.৯৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে, সার্বিক কৃষিখাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। ফলশ্রুতিতে কৃষিখাতে সরকার নানা নীতি-কর্মসূচি গ্রহণ করলেও ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭, ছয় বছরের ব্যবধানে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি ৬.৫৫% থেকে কমে ১.৫৩% এ নেমে এসেছে। এর মধ্যে শস্য ও শাকসবজি'র প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম, ৭.৫৭% থেকে কমে ০.৫%-এ নেমে এসেছে।[৯] অথচ সরকারি হিসাব মতেই, বার্ষিক জিডিপি ৭% হারে মোট দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি অর্জন করতে হলে কৃষিখাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ৪-৪.৫% হতে হবে।[১০] বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি যদি সাড়ে ৩ থেকে ৪ শতাংশে উন্নীত করা যায়, তাহলে অনায়াসেই ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।[১১] যদিও বলা হয়, সরকারের গৃহীত কৃষিবান্ধব নীতির ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে; এবং সেটির ওপর ভিত্তি করে সরকার দেশের সাত শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কিন্তু কৃষিখাতের নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির ধারা সরকারের বাস্তবানাধীন নীতিগুলো কতটা কৃষকবান্ধব সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

সাংবিধানিকভাবে জনগণের খাদ্যের অধিকার অর্জন এবং পুষ্টিমান উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্থায়িত্বশীল কৃষি ও কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পই বাংলাদেশের মত গ্রাম-কৃষিনির্ভর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সূচক ২০১৫'অনুসারে বিশ্বের ১১৩টি দেশের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তার দিক দিয়ে বাংলাদেশ ৯৫তম স্থানে রয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে। বিশ্ব ক্ষুধাসূচক (গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স- জিএইচআই) ২০১৬ অনুযায়ী, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে ১১৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০তম। গত আট বছরে বাংলাদেশ স্কোরে উন্নতি করলেও সার্বিক সূচকে ১৭ ধাপ পিছিয়েছে। ২০০৮ সালে সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৩২ দশমিক ৪ পয়েন্ট। ২০১৬ সালে তা দাঁড়ায় ২৭ দশমিক ১ পয়েন্টে।

এর আগে ১৯৯২ সালে সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫২ দশমিক ৪ ও ২০০০ সালে ৩৮ দশমিক ৫। সর্বশেষ সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত (৯৭তম), পাকিস্তান (১০৭তম) ও আফগানিস্তানের (১১১তম) চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও পিছিয়ে আছে নেপাল (৭২তম), মিয়ানমার (৭৫তম) ও শ্রীলংকা (৮৪তম)।[১২] এছাড়াও, জনসংখ্যা অনুপাতে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি, অপর্যাপ্ত কৃষিসেবা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, খাদ্য সংরক্ষণাগার ও টেকসই কৃষিচর্চার অভাব, কৃষিতে বাণিজ্যিক আগ্রাসন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশে খাদ্য সঙ্কট অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।

খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ নেতিবাচক অবস্থানে থাকলেও কৃষিজ উৎপাদনে বাংলাদেশ অসামান্য সফলতা অর্জন করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে কৃষিখাতে মোট উৎপাদিকা শক্তি সবচেয়ে বেশি।[১৩] বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত সাত বছরে [২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫] দেশের প্রধান খাদ্যশস্য চাল উৎপাদন বেড়েছে ৩৩.৯৩২ লাখ মেট্রিক টন।[১৪] বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, দেশে ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদন ৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সপ্তম ও মৎস্য উৎপাদনের বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। তবে কৃষিজ উৎপাদন বাড়লেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইএফপিআরআই)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে কৃষিখাতে গত সাড়ে তিন দশকে জনপ্রতি ব্যয় বেড়েছে প্রায় ২২০ শতাংশ। বিপুল এ ব্যয়বৃদ্ধির বিপরীতে শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা এসেছে সামান্যই। এই সময়ের মধ্যে ধান, সবজি, আলু ও ফলের জনপ্রতি উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও কমেছে গম, মসলা, তেল ও ডালজাতীয় ফসলের। আইএফপিআরআইয়ের গ্লোবাল ফুড

পলিসি রিপোর্টের মতে, ১৯৮০ সালে কৃষিখাতে জনপ্রতি ব্যয় ছিল ৩ দশমিক ৫৬ ডলার। ২০১৪ সালে এসে এ ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৪১ ডলারে। এ সময়ের মধ্যে ধানের জনপ্রতি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ১৯৭৯-৮০ অর্থবছরে দেশে মাথাপিছু ধানের উৎপাদন ছিল ১৫০ কেজি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩১ কেজিতে। একই সময়ে সবজি জাতীয় ফসল উৎপাদন ২০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৪ দশমিক ৯ কেজি। ফলের উৎপাদন ১৬ থেকে বেড়ে ৩১ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। আর আলুর মাথাপিছু উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ কেজিতে। সরকারি হিসাবে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বা দেশে পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান থাকলেও সকল নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা প্রশ্নাতীত। কেননা, শুধুমাত্র উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কোনভাবে যৌক্তিক পদক্ষেপ নয়। বরং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বণ্টন এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

কেমন আছে ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষকরা

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাসের একটি সরাসরি ইতিবাচক সম্পর্ক থাকলেও দেশের দরিদ্র মানুষের বেশিরভাগই গ্রামীণ কৃষক। দেশের মোট খাদ্য চাহিদা প্রায় ৯০ শতাংশ সরবরাহ করে কৃষাণ-কৃষাণীরা; যাদের ৮৯.৩% ভূমিহীন ছোট ও প্রান্তিক কৃষক। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাবে জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনায় দেশের ২৪.৫ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। মোট দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে আর ১৮ শতাংশ শহরে বাস করে।[১৫] যেহেতু গ্রামীণ মানুষের প্রায় ৮০ ভাগ সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং দেশের মোট দরিদ্রের ৮২ শতাংশ গ্রামে থাকে সেই হিসেবে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষক। দারিদ্র্য অবস্থার মধ্যে থেকেও দেশের খাদ্য চাহিদার প্রায় পুরোটাই যোগান দেয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে [২০০৭] দেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র কৃষক এবং খামার-আয়তন হিসাবে কৃষি উৎপাদনের প্রধানতম চালিকাশক্তিও তাঁরা। তাই দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র কৃষকরা রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ মনযোগ পাওয়ার দাবি রাখে। খানা হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে ৪৯.৮৫ শতাংশ পরিবারই ছোট কৃষক পরিবার। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলো একত্রে দেশের মোট কৃষক পরিবারের ৮৮.৪৮% হলেও তাদের মালিকানাধীন চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৩৬.৩০%। অন্যদিকে দেশের মাত্র ১১.৫১% মাঝারি এবং বড় কৃষক পরিবারগুলোর মালিকানায় রয়েছে দেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৬৩.৩৭%।[১৬] ছোট কৃষক পরিবারগুলোই আমাদের খাদ্য চাহিদার মূল যোগানদাতা এবং দারিদ্র্য হটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেলেও তাঁরা নিজেরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আটকা পড়ে থাকেন। ফলে ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্রমশ: জমিজিরেত হারিয়ে ক্ষুদ্র কৃষক থেকে বর্গাচাষী-কৃষিশ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার মধ্যদিয়ে অর্জিত কৃষি প্রবৃদ্ধি অধিকতর সমতাধর্মী ও বৈষম্যবিরোধী হয়ে থাকে।[১৭] তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে, সেই সাথে কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

বর্গাচাষী: সব সময় আলোচনার বাইরে

ক্ষুদ্র কৃষকদের পাশাপাশি বর্গাচাষীদের সমস্যা সংকটকেও সমানভাবে বিবেচনায় রাখা জরুরি। কেননা, বাংলাদেশের এখন বেশিরভাগ জমির মালিক নিজে চাষ করেন না। বর্গা বা নগদ টাকায় জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্গাচাষী, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরাই মূলত: ফসল উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু, কৃষি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা বা জাতীয় বাজেটে বর্গাচাষী, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে পারছে বলে দৃশ্যমান হয় না। সরকারি সুবিধা, কৃষি-উপকরণ বণ্টন ব্যবস্থা নীতিমালায় বর্গাচাষীদের বিষয়টি উপেক্ষিতই থাকছে। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইএফপিআরআই) জরিপ অনুযায়ী মাত্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাত্র ২৭ শতাংশ কৃষি সম্প্রসারণকর্মীদের সেবা পেয়ে থাকে; অন্যদিকে বড় কৃষকদের মধ্যে এ সেবা পাচ্ছেন ২৮ শতাংশ কৃষক। সেচের ভর্তুকির সম্পূর্ণ সুবিধা সেচযন্ত্রের মালিকের পকেটে যাচ্ছে; কৃষককে সেচবাবদ ভাড়া হিসাবে উৎপাদিত ধানের চারভাগের একভাগ প্রদান করতে হয়। অপরদিকে ২০১৫ সালে বিতরণকৃত কৃষিঋণের ৫.২% পেয়েছেন প্রান্তিক কৃষক, ৯.১% পেয়েছেন ক্ষুদ্র কৃষক। অন্যদিকে বড় কৃষক পেয়েছেন ১৪.৬% এবং মাঝারি কৃষক পেয়েছেন

১২.১%। সরকারি সুবিধা বণ্টন ব্যবস্থায় কৃষির কাঠামোগত বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় না।[১৮] তাই বর্গাচাষী স্বার্থ সংরক্ষার্থেও বিশেষ প্রণেদনা ও নীতিমালা প্রণয়ন দাবি রাখে।

জৈব জ্বালানি: হুমকিতে পড়বে খাদ্য নিরাপত্তা

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার চালের খুদ, ভুট্টা ও চিটা গুড় ব্যবহার করে খাদ্য থেকে জ্বালানি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ সরকার এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, উৎপাদিত জৈব জ্বালানি প্রতি লিটার পেট্রোল ও অকটেনে ৫ শতাংশ হারে মেশানো হবে। এই জ্বালানি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্ট স্থাপন এবং এ বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরিরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। স্বচ্ছ ও বর্ণহীন এই জ্বালানি ব্যবহারে পরিবেশ উপযোগী হওয়ার লক্ষ্যে খাদ্যশস্য ব্যবহার করে ইথানল নামে পরিচিত এই জ্বালানি তৈরির পরিকল্পনা করছে সরকার, যা এখনও আমদানি নির্ভর বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন।[১৯] যেখানে আমাদের দেশে এখনো বহু মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করে তাই খাদ্যশস্য থেকে জ্বালানি তৈরির সিদ্ধান্তটি হবে আত্মঘাতি। ইথানল তৈরিতে ভুট্টা ব্যবহার করা হবে; কিন্তু দেশে উৎপাদিত ভুট্টার বেশিরভাগই মুরগিসহ প্রাণীকুলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং দেশের চাহিদার অর্ধেকই মেটাতে হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল থেকে আমদানি করে। তাই ইথানল উৎপাদন শুরু হলে স্বাভাবিক কারণেই ভুট্টার দাম আরো বেড়ে যাবে এবং মুরগি ও ডিমের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। এছাড়াও মানুষরাও খুদ বলে পরিচিত ভাঙা চাল ও ভুট্টা খায় এবং আটার সঙ্গে ভুট্টা মিশিয়ে তৈরি করা হয় বিভিন্ন খাবার ও বিস্কুট। তাই ভাঙা চাল ও ভুট্টা ব্যবহার করে ইথানল ব্যবহার করা হলে তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুযায়ী, দেশে বছরে এককোটি ৮০ লাখ লিটার ইথানল উৎপাদন করা সম্ভব। তার জন্য ৬০ হাজার টন চাল ভাঙতে হবে, যা দেশের মোট উৎপাদনের ৩.৫ শতাংশ। আর চালের বিকল্প উৎস হিসেবে বছরে ভুট্টা লাগবে ৬২ হাজার টন, যা মোট উৎপাদনের ২.৮ শতাংশ এবং গুঁড়ের ক্ষেত্রে ৯৭ হাজার টন, যা মোট উৎপাদনের সমান।[২০] তবে এই মাত্রার চেয়ে বেশি খাদ্যশস্য জ্বালানি উৎপাদনে ব্যবহার করলে তা খাদ্য নিরাপত্তায় মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে মন্ত্রণালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনেই সতর্ক করা হয়েছে। সাদা চোখেই দেখা যায়, মানুষের ব্যয়ের সবচেয়ে বড়খাত খাদ্যদ্রব্যের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং খাদ্যক্রয়ের ব্যয় অনেক সময় দরিদ্র মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বিপণন সংস্থা টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, এক বছরে মোটা চালের দাম ২৫ শতাংশ বেড়ে ৪২ টাকায় উঠেছে। ২০১৭ ফেব্রুয়ারিতে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল সর্বোচ্চ ৬ দশমিক ৮ শতাংশ। তাই খাদ্যশস্য থেকে জৈব জ্বালানি তৈরির উদ্যোগ এখনই বন্ধ করতে হবে। তা না হলে ইথানল উৎপাদন একবার শুরু হলে এর চাহিদা বাড়তেই থাকবে। জ্বালানির দামের পাশাপাশি এর দাম বাড়বে। ফলে আরও খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হবে এবং স্থায়ীভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করবে। অবশ্য, কৃষিমন্ত্রী ইতোমধ্যে খাদ্য থেকে জ্বালানি তৈরি বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং এ বিষয়ে আরো গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চীনসহ অনেক দেশে খাদ্যশস্য থেকে ইথানল তৈরি নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশ এই আত্মঘাতী পথেই অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করছে। তাই, আমরা মনে করি সরকারকে অবশ্যই খাদ্য থেকে জ্বালানি তৈরির সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে আগে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষিজমি: সুরক্ষায় নেই কোন উদ্যোগ

ভূমি এমন একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, শিল্পপণ্য, ভোগবিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদি সব কিছুরই প্রধান উৎস। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পোন্নয়ন, শিল্পাঞ্চলের বিস্তার, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে,হ্রাস পাচ্ছে আমাদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ। সরকারি হিসাব মতে, প্রতিবছর দেশে কৃষিজমির পরিমাণ ১ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। জাতিসংঘের সহায়তায় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় বলছে বছরে ৬৮ হাজার হেক্টর কৃষিজমি কমছে। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউএস এইডের অর্থায়নে পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ১৯৭৬ সালে আমাদের কৃষিজমির পরিমাণ ছিল ৯৭ লাখ ৬১ হাজার ৪৫০ হেক্টর।

২০০০ সাল পর্যন্ত তা ৩ লাখ ২১ হাজার ৯০৯ হেক্টর কমে দাঁড়ায় ৯৪ লাখ ৩৯ হাজার ৫৪১ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০০০ থেকে ২০১০ সাল নাগাদ ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৪ হেক্টর কমে মোট কৃষিজমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৭ লাখ ৫১ হাজার ৯৩৭ হেক্টরে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য হচ্ছে, ১৯৭৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ২৫ বছরে যে পরিমাণ কৃষিজমি কমেছে, পরের ১০ বছরে কমার পরিমাণ পাঁচ গুণ বেশি; এবং এভাবে কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে গেলে ২০৫০ সাল নাগাদ কৃষিজমির পরিমাণ ৪৮ লাখ হেক্টরে এসে দাঁড়াবে।[২১] তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ বাংলাদেশে সবচেয়ে কম বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ২০০৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, দেশের ২ কোটি ৮১ লাখ ৬৫ হাজার ৭০০ পরিবারের মধ্যে ৫৩.৫৭% পরিবারের চাষযোগ্য জমি আছে এবং অবশিষ্ট ৪৬.৬৩% পরিবারের চাষযোগ্য কোন জমি নেই এবং চাষযোগ্য জমি না থাকা মানুষের সংখ্যা দিন দিন আরো বেড়েই চলেছে। এভাবে কৃষিজমি কমে যাওয়ার ফলে দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্ধেক মানুষের কর্মসংস্থান ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। কৃষিজমি সুরক্ষার প্রশ্নে সরকার ২০১৫ সালে 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন' তৈরি করেছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে কৃষিজমি সুরক্ষা আইনটিও এখনও খসড়া পর্যায়ে আছে। আবার খসড়া এই আইনের শিরোনামটি সাংঘর্ষিক। কারণ কৃষিজমি সুরক্ষা আর ভূমি ব্যবহার এক বিষয় নয়। ভূমি ব্যবহার এক ব্যাপক বিস্তৃত অধ্যায়। ভূমি বিষয়ে দেশে অনেক নীতি ও আইন বিদ্যমান এবং সেই সকল আইনে ভূমি ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনাও রয়েছে। কিন্তু কৃষিজমি নিয়ে কোনো একক স্বতন্ত্র আইন বা নীতি নেই। তাই প্রস্তাবিত আইনটি স্বতন্ত্রভাবে কৃষিজমি ঘিরেই হওয়া প্রাসঙ্গিক। টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্রমহ্রাসমান কৃষিজমি। তাই কৃষিজমি সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরি।

দিতে হবে নারী কৃষকের স্বীকৃতি

গৃহস্থালীর সকল কাজের পাশাপাশি নারীরা বিভিন্নভাবে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, কৃষিতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ৬৯ শতাংশই নারী,[২২] এবং এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিকাজে

নিয়োজিত নারী কৃষকদের ৭৪ শতাংশ গবাদিপশু পালন, ৬৩ শতাংশ স্থানীয় জাতের বীজ সংরক্ষণ, ৪০ শতাংশ শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদন, শস্য মাড়াই ও মাড়াই পরবর্তী কার্যক্রম, খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ কৃষিপণ্য উৎপাদনে যুক্ত রয়েছেন।[২৩] ১৯৯৫-৯৬ সালের শ্রম জরিপে সরকার প্রথম নারী কৃষক এবং কৃষি কাজের নারীর অংশীদারিত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে। জরিপে গৃহপালিত পশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার পরিচালনা, ধান ভানা-সিদ্ধ করা-শুকানো-ঝাড়া-প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ১ কোটি ৩০ লাখ শ্রমশক্তি যুক্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রায় ৫০ লাখই নারী এবং এই বাড়তি নারীশ্রমিকের প্রায় ৭৭ শতাংশই কৃষিশ্রমিক।[২৪] কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব কাজের বিনিময়ে অর্থলাভ তো দূরের কথা পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত কোথাও নারীর কাজের কোনো উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি নেই। রাষ্ট্রীয় প্রণোদনার অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ১ কোটি ৩৯ লাখ কৃষকের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করলেও নারীরা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[২৫] জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যানুযায়ী, সারা বিশ্বে যত কৃষক আছে তাদের মধ্যে ৮০ ভাগই নারী এবং তাদের বেশির ভাগই অপুষ্টি, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যপীড়িত। জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণীত হলেও সেসকল উদ্যোগে নারী কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ উপেক্ষিত থাকছে। ২০১৩ সালে প্রণীত কৃষিনীতিতে 'নারী কৃষক' শিরোনামে যে অধ্যায়টি সংযুক্ত হয়েছে সেখানেও নারী কৃষকের অবদানের বিষয়টি বিন্দুমাত্র প্রতিফলিত হয়নি। স্থায়িত্বশীল কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে কৃষিতে নারীর প্রত্যক্ষ অবদানকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কৃষিনীতিসহ অন্যান্য নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জন করতে হবে। সকল রাষ্ট্রীয় নীতি-প্রণোদনা-প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে নারী কৃষকদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতায় নারী কৃষকদের মাঝে পর্যাপ্ত ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ

কৃষির টেকসই উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উপকরণ

যেমন সার, বীজ, সেচের পানি ইত্যাদি উপযুক্ত সময়ে পাওয়া অতি জরুরি। সবুজ বিপ্লবের পূর্বে দেশের কৃষকরা আবাদ করতো নিজেদের খোরাকির জন্য- বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে। কৃষকরা স্থানীয় বীজ দিয়ে আবাদ করতো এবং তা ছিল পুরোপুরি প্রকৃতিনির্ভর। পাকিস্তান থাকতেই এ দেশে শুরু হয় 'সবুজ বিপ্লব'। কৃষিতে আগমন ঘটে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ফলে কৃষি উপকরণের জন্য কৃষকদের বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা বহুগুণ বেড়ে যায়। সবুজ বিপ্লবের প্রথম দিকে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান (উফশী) সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকার কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান শুরু করে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলে ভর্তুকি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কৃষি উপকরণ বিতরণ শুরু হয়। কৃষকদের মাঝে বীজ, সার, সেচের পানি বিতরণের দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) ওপর ন্যাস্ত। পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেচের পানির ব্যবস্থা করার জন্য। কৃষিতে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের কারণে ধানের উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ১৯৮০-র দশকে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শে কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম (স্যাপ) পরিচালনা করা হয়। স্যাপের আওতায় কৃষি উপকরণ বাজার ধীরে ধীরে উদার করা হয় এবং এক সময় তা বেসরকারি খাতের হাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে সার, বীজ, কীটনাশক এবং সেচ উপকরণ আমদানি ও বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণকে মূল বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ওপর জোর দিয়ে খামারভিত্তিক চাষাবাদকে উৎসাহিত করেছে। সরকার একদিকে জলবায়ু সহনশীল ও স্থায়িত্বশীল কৃষির কথা বললেও অন্যদিকে 'হাই ইনপুট, হাই আউটপুট' কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে। কিন্তু কৃষি অর্থনীতির 'ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি' বিবেচনায় নিলে এরূপ কৃষি উৎপাদন উপকরণের (যেমন: রাসায়নিক সার, বালাইনাশক, হরমোন, ভিটামিন ইত্যাদি) ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে একটা পর্যায় পর্যন্ত উৎপাদন বাড়লেও এক সময় স্থিতাবস্থায় পৌঁছানোর পর উৎপাদন ক্রমশ: হ্রাস পেতে থাকে। এ জাতীয় কৃষি ব্যবস্থায় কৃষি উপকরণ-সরবরাহকারি কোম্পানি এবং ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হলেও উৎপাদক কৃষক লাভবান হয় না। বস্তুত: আমরা এখন তথাকথিত উন্নত দেশের কৃষির মডেল অনুসরণ করছি যা হাজার হাজার ডলার ভর্তুকি দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এই কারণেই মাত্র এক/দেড় দশকের ব্যবধানে দেশের পোল্ট্রি চাষীদের এখন টিকে থাকার জন্য ভর্তুকি দাবি করতে হচ্ছে।

করপোরেট বীজ ব্যবসা: কৃষি বাণিজ্যিকীকরণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার একটি নমুনা

বীজ কৃষির কেন্দ্রীয় পুঁজি ও প্রাণ। আবাদের প্রথম শর্তই হলো বীজ। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ ধানের বৈচিত্র্যের জন্য খ্যাত ছিলো। এখনো প্রায় পাঁচ হাজার জাতের ধান রয়েছে।[২৬] কিন্তু সেই বীজ আজ দারুণভাবে বিপন্ন। কৃষকের নিজস্ব জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় সংরক্ষিত প্রাণবৈচিত্র্যবান্ধব বীজসমূহ আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। সবুজ বিপ্লব শুরুর পর হাইব্রিড বীজের হাত ধরেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম বা জিএমও প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি চলে যাচ্ছে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। 'উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা, সেচ প্রযুক্তি উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি এবং কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন সার সরবরাহ করা'[২৭] র উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন তৈরি হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি এখন কৃষি উপকরণের বাণিজ্যিকায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করছে। জাতীয় কৃষিনীতি ১৯৯৩ এর 'বিএডিসির বীজ উইং শক্তিশালীকরণ' অংশে দেখা যায়, আমাদের বীজনীতি এটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থরক্ষার চেয়ে বীজ বাণিজ্যিককরণের পক্ষে একটি দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, ১১.২.২ - ভূমিকা এবং কার্যাবলীঃ 'অন্যান্য কাজের মধ্যে বীজ উইং এর কতিপয় ভূমিকা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ: (খ) বেসরকারি খাতের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অন্যান্য বীজ উৎপাদন। যে সকল বীজ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলির উৎপাদন থেকে বিএডিসি ধীরে ধীরে সরে আসবে। (গ) বেসরকারি খাতে বীজ শিল্প উন্নয়ন

ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বীজ উইং কারিগরি সহযোগিতা এবং অন্যান্য সহায়তা/সেবা প্রদান করবে। ১১.২.৫– বিপণনঃ উপজেলা পর্যায়ে বিএডিসির বীজ বিক্রয়কেন্দ্রগুলো ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে বেসরকারি বীজ ডিলারদেরকে সে স্থলে নিয়োজিত করা হবে। আঞ্চলিক এবং ট্রানজিট বীজ কেন্দ্রগুলো বেসরকারি খাতের উত্তোলন স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করে উন্নয়ন করা হবে।' দেশে প্রতি বছর সাড়ে ১১ লাখ টন বীজের চাহিদা থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চাহিদার ২৩ শতাংশ বা দুই লাখ ৬৩ হাজার টন বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) মাত্র দেড় লাখ টন এবং বাকি বীজ দেশের ১৭৬টি কোম্পানির মাধ্যমে জোগান দেওয়া হচ্ছে।[২৮] সরবরাহকৃত এসব বীজের ১০ শতাংশের আবার মানহীন বলে অভিযোগ রয়েছে। কৃষক প্রতারিত হলেও তাদের কোনো সুরক্ষা দেয়া হচ্ছে না। বীজ যেহেতু কৃষির প্রাণ, তাই বীজের অধিকার থাকতে হবে কৃষকদের কাছে। কিন্তু, হাইব্রিড জাতীয় বীজ বাজারজাতকরণের ফলে বীজ সংরক্ষণের সেই সুযোগ আর থাকছে না। যদি এভাবে কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষা করে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলি তাহলে কৃষিকাজ কৃষকের হাতে থাকবে না, চলে যাবে দেশীয় এবং বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। 'নটিফায়েড ক্রপ' নামে পরিচিত অতিদরকারি পাঁচটি শস্যের [ধান, গম, আখ, আলু এবং পাট] গবেষণা ও জাত উদ্ভাবনের দায়িত্ব সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। ১৯৭৭ সালের সিড অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী এই পাঁচ শস্যের বীজ যদি কখনো দরকার হয় তাহলে শুধু সরকারিভাবে তা আমদানি করার নিয়ম থাকলেও ১৯৯৮ সালে 'সিড-অর্ডিন্যান্স' সংশোধন করে বেসরকারিভাবে হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হলে ঝড়ের বেগে নপুংসক ধান ও সবজি বীজ ঢুকে পড়ে দেশে। ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে হাইব্রিড বীজ ব্যবসা।[২৯] ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস (বিটি) বেগুন চাষের অনুমোদন দেয়ার পর এবার জেনেটিক্যালি মডিফাইড (জিএম) আলুর ফিল্ড ট্রায়াল চলছে বাংলাদেশে। জিএম জাতের বীজ দিয়ে চাষাবাদের ফলে ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত জাতগুলোর জায়গা দখল করে নিবে জিএম বীজ। ফলে ধীরে ধীরে দেশি বীজের সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের ধারাবাহিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে এবং এসব হরেক রকম বেগুন বীজ হারিয়ে যেতে পারে। ফলে বীজ নিরাপত্তা চলে যাবে প্রাইভেট করপোরেশনের হাতে।[৩০] বীজের ওপর কৃষকের মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। বীজের ট্রেডিং নয় ব্রিডিং বাড়াতে হবে, বীজ বিপণনে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

কৃষিপণ্যের মূল্য: কৃষক কী আদৌ লাভের মুখ দেখে?

সরকারের নীতি, কর্মপরিকল্পনায় ও জাতীয় বাজেটে দেশ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন যতটা গুরুত্ব পেয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টা ততটা গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না। পক্ষান্তরে, ভোক্তার জন্য চালের মূল্য কম রাখতে সরকার যতটা তৎপর কৃষকের জন্য লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে তার কিয়দাংশও দেখা যায় না। পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে সরকারি প্রায় সব নীতি ও পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র উৎপাদকদের চাইতে ব্যবসায়ীদের পরিসরকে বিস্তৃত করছে। খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে যাদের মুখ্য অবদান সেই কৃষকরা ক্রমাগতভাবে তার উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের ব্যবসায়ী মহল এবং বৈদেশিক দাতা সংস্থাগুলোর পরামর্শে গৃহীত নীতির ফলে অবাধ বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রান্তিক ক্ষুদ্র কৃষকরা। একদিকে কৃষির উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, অপরদিকে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া কৃষকদের ক্ষতির বড় কারণ। ফলে কৃষি কাজে উৎসাহ হারাচ্ছে কৃষক। এ অবস্থায় কৃষকরা তাদের হালের জমির কিয়দাংশ পতিত রাখছে অথবা অন্য কাজে ব্যবহার করছে। গবেষণা খামারে বিভিন্ন ফসলের যে পরিমাণ উৎপাদন হয়, কৃষকের খামারে তার দুই-তৃতীয়াংশ ফলনও সম্ভব হচ্ছে না। কৃষিতে উন্নত দেশের কৃষকরা বিভিন্ন শস্যের যে গড় ফলন পেয়ে থাকেন, বাংলাদেশের কৃষকদের অর্জিত ফলন তার অনেক নিচে। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে তাদের উৎসাহ ধরে রাখার জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য পণ্যমূল্যে সহায়তা করা দরকার। তার জন্য বিভিন্ন দেশে দু'ধরনের পদ্ধতি চালু আছে। এর একটি হল কৃষি পণ্যের মূল্য সমর্থন এবং অপরটি হল সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা। অপরদিকে খাদ্যশস্য ধান/গম ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারি মূল্য সহায়তায় মিল মালিকরাই লাভবান হন। তাছাড়া সরকারি ক্রয়মূল্য চলতি বাজার দরের চেয়ে কখনো কখনো কম থাকে। সরকারি

ক্রয়মূল্য কম থাকায় এ বছর মিল মালিকরা সরকারি গুদামে চাল দিতে রাজী হচ্ছেন না। বর্তমানে বাজারে প্রতি কেজি চালের পাইকারি মূল্য ৪৪ থেকে ৪৫ টাকা। আর সরকার প্রতি কেজি চালের সংগ্রহ মূল্য ঠিক করেছে ৩৪ টাকা।[৩১] তবে সরকারিভাবে যে পরিমাণ ধান ও গম সংগ্রহ করা হয় তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। বাজারে পণ্যমূল্যের ওপর প্রভাব ফেলার জন্য তা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে সরকারি সংগ্রহের পরিমাণ মোট উৎপাদনের প্রায় ৪ শতাংশ।[৩২] এটি ন্যূনপক্ষে ৮ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে এবং তা সরাসরি কৃষকের খামার থেকে ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া পাট, ডাল ও তেলবীজসহ অন্যান্য ফসলের জন্যও সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। বর্তমানে দেশে প্রায় ২০ লাখ টন খাদ্যশস্য ধারণক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম রয়েছে, গুদামের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সম্প্রতি উৎপাদন খরচের ওপর মাত্র ৮ থেকে ১০ শতাংশ লাভ দেখিয়ে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তা কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ হওয়া উচিত। ২০১৫ সালে উদ্বৃত্ত চাল শ্রীলংকায় রপ্তানি করা সত্ত্বেও প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টন চাল ভারত থেকে আমদানি করা হয়েছিল, যা সেই বছর ধানের মূল্য হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। সরকারি এসব নীতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সরকার যতটা উদ্যোগী কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণে ততট আগ্রহী নয়। বিগত বাজেটগুলোতে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে 'কৃষক বিপণন দল' ও 'কৃষক ক্লাব' গঠন এবং গ্রোয়ার্স মার্কেট স্থাপনের যে সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে তা প্রকৃত প্রস্তাবে কতটা সফল তা নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। কৃষির ঢালাও বাণিজ্যিকীকরণের ফলে এবং ত্রুটিপূর্ণ বর্তমান মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক যা উৎপাদন করে তার লভ্যাংশটুকু লুটেপুটে নেয় মধ্যস্বত্বভোগীরা যেখানে কৃষক তার উৎপাদন ব্যয়টাও উঠাতে পারে না। অন্যদিকে, ভর্তুকি বা ঋণ হিসেবে যা বরাদ্দ দেওয়া হয় তাও একশ্রেণীর সুবিধাভোগীদের পকেটে চলে যায়। কাজেই, শুধু কিছু গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করে এই জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন বর্তমান বাজার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার যার কোন দিকনির্দেশনা বিগত বাজেটগুলোতে পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি দেশের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে 'ন্যাশনাল সার্ভে অ্যান্ড সেগমেন্টেশন অব স্মলহোল্ডার হাউজহোল্ডস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে তারা দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। 'ক্রেতাদের সুযোগ নেয়ার প্রবণতা, পরিবহন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে ফসলের ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছেন না তারা। যেটুকু উপার্জন হচ্ছে, তার প্রায় সবটুকুই চলে যাচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাপনে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্রেতাদের সুযোগ নেয়ার প্রবণতার কথা জানিয়েছেন ৪৪ শতাংশ। যোগাযোগ অবকাঠামোর অভাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের দিকে আঙুল তুলেছেন যথাক্রমে ১৪ ও ১১ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক।'[৩৩] দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের রক্ষা করতে হলে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য সমবায় ব্যবস্থায় কৃষকদের সংগঠিত করে একটি সমষ্টিগত উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। সর্বোপরি কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি 'মূল্য কমিশন' গঠন করতে হবে।

কৃষি ভর্তুকি: বড় কৃষকের জন্য রাষ্ট্রীয় যোগান

কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তির ধারণা উৎসাহিত করার জন্য প্রদান করা হয় উপকরণ ভর্তুকি। স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ। ১৯৯০ এর দশকে দিকেই কৃষিখাতের সংস্কার সাধন করা হয়। এ সংস্কারের কারণে কৃষিখাতে সরকারের বিনিয়োগ আনুপাতিক হারে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালে কৃষিখাতে সরকারি রাজস্ব এবং মূলধনী বিনিয়োগ যথাক্রমে ৩১ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৬ সালে ৩ শতাংশ এবং ১.২ শতাংশে এসে দাঁড়ায়।[৩৪] কৃষিখাত থেকে রাষ্ট্রের এই প্রত্যাহার দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বর্তমান সরকারের আমলে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বেড়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে খুব সামান্যই ভর্তুকি আছে রাসায়নিক সারের ওপর। কৃষক যে ভর্তুকি পায় তা আচ্ছাদিত থাকে এবং এ সম্পর্কে তারা কমই জানতে পারছেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে সারের মূল্য হ্রাসের ফলে এ ভর্তুকি গুরুত্ব হারিয়েছে। ফলে মোট বাজেটের অংশ হিসেবে কৃষি ভর্তুকি হ্রাস পাচ্ছে বছরের পর বছর। এক্ষেত্রে কৃষিযন্ত্র সংগ্রহে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ৫০ শতাংশ

ভর্তুকি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। এ যন্ত্রগুলোর মধ্যে আছে রিপার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, কমবাইন্ড হারভেস্টার, পাওয়ার থ্রেসার ও সিডার। এটি ভালো উদ্যোগ কিন্তু এর ব্যাপ্তি খুবই কম এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য এই জাতীয় বড় আকারের যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না; অন্যদিকে এই জাতীয় ক্রয়ের সুযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক পরিচয়ে বড় কৃষকরাই পেয়ে থাকে। কিন্তু চাষের যন্ত্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো ভর্তুকি দেয়া হয় না। এ কাজে প্রাণী শক্তির বিকল্প হিসেবে কৃষকরা ভাড়ায় পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর ব্যবহার করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক নিজ উদ্যোগে এসব পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর ক্রয় করতে আগ্রহী হলেও দাম বেশি হওয়ায় তারা ক্রয় করতে পারেন না। এসকল ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করা দরকার।

কৃষিতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন

কৃষিতে বিনিয়োগ বা উন্নয়ন বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় সবসময়ই অপ্রতুল দেখা যায়। কৃষি যদিও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিখাত কিন্তু শিল্পের ব্যক্তিখাতের প্রতি যে রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়, কৃষিতে পুঁজিবাদের উদ্ভব হলেও কৃষিতে ব্যক্তিখাতের প্রতি রাষ্ট্র ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সেই মনোযোগ নেই। মানুষের সঞ্চয় ও বিনিয়োগে অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংকিং খাতের জন্ম হয়েছিলো। কিন্তু গরিব-সম্পদহীন ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এ খাত তেমন কোনো প্রত্যাশা জাগাতে পারেনি। সেই ঘেরাটোপে পড়ে গেছে আমাদের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা। ইতোমধ্যে সরকরা ১০ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ন্যূনপক্ষে ২৫ শতাংশ ঋণ কৃষিখাতে প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া, মসলা ফসলের জন্য ৪ শতাংশ সুদে এবং দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য ৫ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে। গত ৮ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৯০.০৭ শতাংশ বেড়েছে, প্রতি বছর গড়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৮.০৩ শতাংশ হারে। কিন্তু তারপরও গ্রামাঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এখনো কৃষিঋণে সুদের পরিমাণ বেশি, কৃষিঋণের সুদের হার ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা জরুরি। কৃষিঋণ বিতরণের সীমানা বাড়লেও প্রান্তিক ও দরিদ্র কৃষক পরিবারগুলো এই

সেবাগুলোর কতটা পাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাই, বর্তমান অবস্থান থেকে কৃষির উৎপাদন আরো বাড়াতে হলে কৃষিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনের বিকল্প নেই। আর এজন্য প্রয়োজন কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো। বর্তমানে যে ধারায় কৃষিতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তা দিয়ে একটি স্থায়িত্বশীল কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অসম্ভব হবে। জাতীয় পরিসরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রে কৃষির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। কৃষির বিকাশের মাধ্যমেই সর্বত্র শিল্প ও সেবাখাত বিকশিত হয়েছে, সেজন্য সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল কৃষিতে বিনিয়োগে জোর ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

কৃষি-বাজেট ২০১৭-১৮

বাজেট একটি সরকারের রাজনৈতিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার এক বছরের পরিকল্পনা। বাজেটের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক সরকারের উন্নয়ন দর্শন, নীতি-কাঠামো ও কর্মকৌশল প্রতিফলিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী কৃষি খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে বলেছেন, 'আমাদের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। আমাদের কৃষি জমি অনবরত হ্রাস পাচ্ছে। সে জন্য গ্রামে যত্রতত্র স্থাপনা নির্মাণকে নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়টি এখন থেকেই বিবেচনায় নিতে হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকের উন্নয়নে চলমান কার্যক্রম আমরা আরো জোরদার করব। ওই কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, বৈরী পরিবেশে অভিযোজনে সক্ষম ধানের জাত উদ্ভাবন, ফসল সংগ্রহের আগে ক্ষতি কমানো, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, সেচ সম্প্রসারণ, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি, জেনেটিক্যালি মোডিফাইড প্রযুক্তির প্রচলন, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু পাটের জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা, পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, কৃষিখাতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি প্রভৃতি।' অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় যা বলেছেন সেটি অংকের হিসাবে একটু মিলিয়ে দেখা জরুরি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃষিখাতে মোট ১৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা মোট প্রস্তাবিত বাজেটের ৩.৪০ শতাংশ। ফলে গেলো বছরের চেয়ে কৃষিখাতে বরাদ্দ ৭৬ কোটি টাকা কমেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষিখাতে মোট ১৩ হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮

সাল নাগাদ মোট বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫৫.৩২ শতাংশ। পক্ষান্তরে, সার্বিক কৃষি খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। বাজেটের আকার গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বাড়লেও, কৃষির জন্য করাদ্দ আনুপাতিক হারে না বাড়িয়ে বরং তিনি তা কমিয়ে দিয়েছেন।

বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কৃষিখাতের গুরুত্ব স্বীকৃত নয়। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের আকার দ্রুতহারে বাড়লেও জাতীয় বাজেটে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দ ক্রমহ্রাসমান, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। মোট বাজেটে আনুপাতিক হারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রতি বছর নিয়মিত কমছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৮.৪৪ শতাংশ, আর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২.২ শতাংশ ছিল এই মন্ত্রণালয়টির জন্য। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের মাত্র ৩.১২ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য, অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষির জন্য বরাদ্দ মাত্র ১.২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জন্য বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১৩,৬৭৫ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে ১৩,৩৭৬ তা করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ১৩,৬০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বছরের বাজেটের চেয়ে এবারের কৃষি বাজেটে আরো ৭৫ কোটি টাকা কম প্রস্তাব করা হচ্ছে । ২০১৭-১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ৩০%, অথচ কৃষির জন্য বরাদ্দ গত অর্থ বছরের তুলনায় কমানো হয়েছে ০.৮১%! ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৪.০১ শতাংশ, অথচ আগামী অর্থ বছরের জন্য এখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ৩.৪ শতাংশ।

গত এক দশকে কৃষিতে বাজেট ধারাবাহিকভাবে কমছে। বর্তমান সরকারের চলমান দুই মেয়াদের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষিতে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ১০.৯%, ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ৯.৮%, ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ৯.৬%, ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ১১.৩%, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ৯.২%, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ৭.৮%, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ৭.০%, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ৬.৭%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট মোট বাজেটের ৬.১%। এই ৬.১ শতাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। যদি শুধু কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা (৪.০১%), যা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে হয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকা (৩.৪০%)। যদি শুধু টাকার অঙ্কে হিসাব করি তাহলে গত অর্থবছরের তুলনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমেছে ৭৬ কোটি টাকা এবং শতাংশে হিসাব করলে মাত্র .৬১%।

গেল বছরের মত এবারের বাজেটেও ৯০০০ কোটি টাকা কৃষি ভর্তুকি রাখা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মূল বাজেটে ৯০০০ কোটি টাকা থাকলেও সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৬০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। তার মানে ৩০০০ কোটি টাকা কম খরচ করা হয়েছে বা কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃষিতে ৯০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হলেও সংশোধিত বাজেটে তা ৭০০০ কোটি করা হয়। বিগত দুই বছরের ধারাবাহিকতায় আশঙ্কা করা যায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তাও হয়ত যথার্থভাবে ব্যবহার করা হবে না। কৃষিতে ভর্তুকি মানেই কৃষিতে বিনিয়োগ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কৃষির বাজেট প্রণয়ন এবং বরাদ্দ প্রদানের আন্তর্জাতিক নানা পরিস্থিতি ও নীতিগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন; মনে রাখা ভালো, উন্নত দেশের কৃষি এবং বাংলাদেশের কৃষির বাস্তবতা এক নয়। উন্নত দেশগুলো দীর্ঘদিন কৃষিতে বড় অংকের কৃষি ভর্তুকি দিয়ে তাদের কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন ঘটিয়েছে, কৃষকের সক্ষমতা বেড়েছে, তাদের বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষকরা প্রতিষ্ঠান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরামর্শ মতে উন্নত একটি দেশে ভর্তুকি বন্ধ করা আর বাংলাদেশে ভর্তুকি বন্ধ করা এক নয়। বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং ধনী দেশগুলোর চাপে বাংলাদেশ কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে। এটি কোনভাবেই কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক বাংলাদেশের কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তার ও প্রবৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না।

২০১৬ সালে বর্তমান সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে টেকসই করার লক্ষ্যে 'জাতীয় জৈব কৃষিনীতি' প্রণয়ন করেছে। যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এ বছরের বাজেটে এই উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই, নেই আলাদাভাবে কোনো বাজেট বরাদ্দ। জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন, বর্ধিতকরণ, মান নিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। এবারেও সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় কৃষির উন্নয়নে উন্নতমানের বীজ সরবরাহের কথা বললেও বিএডিসির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ দেখে বীজ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় বীজের ওপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, বিএসডিসিকে শক্তিশালী করা, জলবায়ু সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবনের কোন কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে মনে হয় না। বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৪২৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকা (প্রায়), ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ৪০৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা (প্রায়)।

কৃষক যেন ন্যায্যমূল্য পায় এই জন্য অর্থমন্ত্রী চাল আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিপণ্যের জন্য আগাম কোনো সমর্থন মূল্য ঘোষণা করা হয় না। ধান ও গমের জন্য উৎপাদন মৌসুমে শুধু সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা যা উৎপাদন করে তা ধান আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি করে দেন। ফলে লাভের টাকা চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে। সরকার তাই চাল কেনা কর্মসূচি চালালে তার সুফল কৃষকের কাছে খুব একটা যায় না। আবার, এমন সময়ে চাল বা ধান সংগ্রহও শুরু করা হয়, যখন তা প্রকৃত কৃষকের হাত থেকে চলে যায়। তবে যে পরিমাণ ধান ও গম সংগ্রহ করা হয় তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। বর্তমানে এর পরিমাণ মোট উৎপাদনের কমবেশি ৪ শতাংশ। এটি কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে এবং তা সরাসরি কৃষকের খামার থেকে ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া পাট, ডাল ও তেলবীজসহ অন্যান্য ফসলের জন্যও সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

বাজেটে চাল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপের কথা বললে কৃষির অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। অথচ প্রতিবছর আমাদের কৃষিপণ্য আমদানি বেড়েই চলছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে আমাদের কৃষিপণ্য আমদানি ব্যয় ছিল ৬৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা ৪,৪৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের আমদানি বিকল্প নীতি গ্রহণ করে অভ্যন্তরীণ কৃষির উৎপাদন দ্রুত বাড়াতে হবে এবং তার জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে। কিন্তু, এভাবে বাজেটে তা দেখা যায়নি। বরং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদন ৪.৫ শতাংশ হারে বাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যমাত্রা নামিয়ে সর্বোচ্চ ৩.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে নির্ধারণ করার ফলে কৃষিতে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আদৌ গ্রহণ করা হবে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়। তবে কৃষিখাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো না হলে ভবিষ্যতেও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না এবং কৃষিপণ্য আমদানি নির্ভরতা বাড়তেই থাকবে। এছাড়া, কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও সরকারি-বেসরকারি কৃষিপণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনতে 'জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন' গঠন করতে হবে। বিগত কয়েক বছর ধরে ন্যায্য মূল্য কমিশন গঠনের দাবি থাকলেও এই বিষয়ে সরকারের এখনও কোনও ইতিবাচক উদ্যোগ নেই।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘন ঘন ঝড়, লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, আকস্মিক বন্যা এবং এর ফলে জলবাদ্ধতা, প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের স্বাভাবিক চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। কৃষিজমি হ্রাস ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সার্বিকভাবে বাড়তি শস্য উৎপাদনের চাপ থাকার ফলে গত কয়েক দশকে ধান, ফল ও সবজি উৎপাদন বাড়লেও তা ব্যয় অনুপাতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আবার অন্যান্য ফসলের জনপ্রতি উৎপাদন না বেড়ে উল্টো কমেছে; যার অর্থ হলো, শস্যের বহুমুখিতা সঠিক পথে নেই। যেহেতু আমাদের দেশে ক্ষুদ্রায়তনের জমি, উন্নত বীজ ও উপকরণ এবং প্রযুক্তির অভাব মোকাবেলা করে কৃষি কাজ করতে হয় তাই জমির

উর্বরা শক্তি ধরে রাখা এবং এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আরো উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ বাড়ানো হবে। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি রাসায়নিক সারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে এনে ঘাতসহিষ্ণু জাতের ফসল চাষে মনোযোগ দিতে হবে। বাজেট বক্তৃতায় জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির কথা বলা হয়েছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে কৃষিকে বাঁচাতে কী উদ্যোগ নেওয়া হবে তার সুনির্দিষ্ট কৌশল থাকা উচিৎ জাতীয় বাজেটে। প্রস্তাবিত বাজেটে এরকম কিছু নেই। নানা কারণে দেশ কৃষিজমি হারাচ্ছে' বাজেট বক্তৃতায় সেটি উল্লেখ করলেও বাজেটে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই।

হাওর এলাকার সাম্প্রতিক বন্যার প্রকোপ দেশের কৃষিখাতে অন্যতম আলোচিত একটি বিষয়। হাওর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তিনি বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ ৩ লাখ ৩০ হাজার পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়ার পাশাপাশি ৫৭ কোটি টাকার নগদ সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 'এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ফর দি পুউরেস্ট' কর্মসূচির আওতায় আরও ৮২ কোটি ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়াও কৃষি পণ্য রপ্তানিতে ৩০% নগদ প্রণোদনা, বেশ কিছু কৃষি পণ্যকে ভ্যাটের আওতার বাইরে রাখার ঘোষণা, সেচ যন্ত্রের বিদ্যুৎ বিলে বিশেষ ছাড় প্রশংসীয় উদ্যোগ। কিন্তু কৃষি ও কৃষকের বর্তমান সংকট, সাজেক ও থানচিতে সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্টি খাদ্য সংকট ইত্যাদি বিবেনায় এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বাজেট কতটুকু যথার্থ তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়ে গেছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে বাজেটে কোথায়ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশনা নেই।

দেশের প্রান্তিক কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার এবং সে অনুযায়ী কৃষিতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা জরুরি। এ বিষয়ক নীতিকৌশল ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন:

১. বাজেটের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে জাতীয় বাজেটের ১৫-২০% কৃষিতে বরাদ্দ রাখতে হবে;

২. জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলা করে জলবায়ু সহিষ্ণু স্থায়িত্বশীল কৃষি চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কৃষক পর্যায়ে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু স্থায়িত্বশীল কৃষিচর্চার কৌশল ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণাখাতে বরাদ্দ রাখতে হবে;

৩. প্রকৃত কৃষকদের নিয়ে 'উৎপাদন ও বিপণন সমবায়' গঠন করে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও হিমাগার স্থাপন করতে হবে। 'শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প'কে পুনরুজ্জীবিত করে 'শস্য সংরক্ষণ ঋণ' চালু করতে হবে।

৪. কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও সরকারি-বেসরকারি কৃষিপণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনতে 'জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন' গঠন করতে হবে। সরকারিভাবে ধানের আগাম মূল্য ঘোষণা করতে হবে এবং নির্ধারিত ডিলারের কাছে কৃষকেরা যাতে সরাসরি ধান বা কৃষি সমবায়গুলো তাদের প্রক্রিয়াজাতকৃত চাল বিক্রি করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। মূল্য নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং ধানের দাম সরাসরি কৃষকের বা কৃষক সমবায়ের ব্যাংক হিসাবে ট্রান্সফার করতে হবে;

৫. ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সুদবিহীন বা স্বল্পসুদে মৌসুমভিত্তিক কৃষিঋণ সহজলভ্য করতে হবে। বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সরকারি সুবিধা ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৬. নারী কৃষকদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঋণসহ সকল সরকারি পরিসেবা ও প্রণোদনায় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নারী কৃষিশ্রমিককের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিসেবা ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কৃষি নীতিমালায় সুস্পষ্ট বিধান রাখতে হবে। নারীবান্ধব কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ করতে হবে এবং বাজেটে নির্দেশনা রাখতে হবে;

৭. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক ঘোষিত 'লাঙ্গল যার জমি তার' নীতির ভিত্তিতে ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। 'ভূমি ব্যাংক' ব্যবস্থা চালু করে অনুপস্থিত ভূমিমালিকদের কাছ থেকে জমি 'ভূমি ব্যাংকে' জমা নিয়ে তা প্রকৃত কৃষকদের চাষাবাদের জন্য সহজলভ্য করা যেতে পারে। কৃষিজমি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে;

৮. ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ, বিটি বেগুন, গোল্ডেন রাইসসহ বিতর্কিত জিএমও কৃষি প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। ফসলভিত্তিক আঞ্চলিক বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণাগার তৈরি করতে হবে। বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে। এ জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

৯. দেশের মৃতপ্রায় নদীগুলোকে বাঁচাতে হবে এবং নদীর পানিভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। পাশাপাশি, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়সহ সকল সকল জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত 'জাল যার জলা তার' নীতির আশু বাস্তবায়ন করতে হবে;

১০. দেশীয় গরু-ছাগল-মহিষ-ভেড়া এবং হাঁস-মুরগির বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিপণনে সরকারি সেবা ও প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, বিদ্যমান পোল্ট্রি শিল্প ও প্রাণী সম্পদখাত উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা বৃদ্ধি করতে হবে;

১১. জলবায়ু সহনশীল স্থায়িত্বশীল কৃষি প্রযুক্তি তথা জৈব সার, বালাইনাশক, আইপিএম-এর মত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ও ভর্তুকি দিতে হবে;

১২. খাদ্যশস্য পুড়িয়ে জৈব জ্বালানি উৎপাদনের আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করতে হবে;

১৩. যে কোনো ধরণের দুর্যোগের ক্ষতির হাত থেকে ক্ষুদ্র কৃষকদের রক্ষার জন্য 'শস্য বীমা' চালু করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১.http://documents.worldbank.org/curated/en/951091468198235153/Dynamics-of-rural-growth-in-Bangladesh-sustaining-poverty-reduction

২.http://www.dw.com/bn/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4/a-19374149

৩.http://www.moa.gov.bd/site/page/4fb627c0-d806-4a7e-a1cd-b67d4bc85159/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8

৪. কৃষি সাংবাদিকতা।

৫. ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/১৬-২০১৯/২০ [প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, নাগরিক ক্ষমতায়ন], সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কৃষি খাত, জিয়াউল হক মুক্তা, দৈনিক সমকাল, ১৯ অক্টোবর ২০১৫

৭.http://www.jugantor.com/sub-editorial/2017/05/25/127266/%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4

৮. Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic for Bangladesh, BRAC and the UK's Department for International Development./ http://www.thedailystar.net/business/agriculture-vital-poverty-reduction-study-1353934

৯. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬

১০. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1363.pdf

১১. বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের আয়ের উৎস কৃষি, দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৬

১২. বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক: দুর্বল অবস্থান থেকে বেরোতে পারছে না বাংলাদেশ, দৈনিক বণিক বার্তা, ১ আগস্ট ২০১৭

১৩.http://www.prothom-alo.com/economy/article/861583/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%AE%E0%A7%AD-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF

১৪. http://www.bssnews.net/bangla/newsDetails.php?cat=2&id=326278&date=2016-01-11

১৫. আর নয় কৃষি জমির অপচয়, মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি, দৈনিক যুগান্তর,২৬ অক্টোবর, ২০১৬

১৬. কোরবান আলী স্মারক গোলটেবিল ডায়ালগ: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার, কৃষির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, ২৮ নভেম্বর, ২০১৪

১৭. সামগ্রিক কৃষি সংস্কার কর্মসূচি, সিএসআরএল ২০০৭

১৮. আএফপিআরআই, বণিক বার্তা, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
১৯.http://sustainability.thomsonreuters.com/2017/05/05/in-threat-to-food-security-bangladesh-moves-to-burn-grain-for-fuel/
২০. http://bangla.bdnews24.com/economy/article1328451.bdnews
২১.http://bonikbarta.net/bangla/news/2017-04-10/113288/%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-/
২২.W. M. H. Jaim and Mahabub Hossain (2009). Women's Participation in Agriculture in Bangladesh 1988-2008: Changes and Determinants. Retrieved from http://research.brac.net/publications/final%20hanoi%20paper.pdf
২৩.Ruchira Tabassum Naved, Nur Newaz Khan, Md. Harisur Rahman and Khandker Liakat Ali (2014). A Rapid Assessment of Gender in Agriculture of Bangladesh. Retrieved from https://www.academia.edu/2413829/A_Rapid_Assessment_of_Gender_in_Agriculture_of_Bangladesh?auto=download
২৪. কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার
২৫. কৃষিতে বাড়ছে নারীর ভূমিকা, দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৫ জানুয়ারি ২০১৬
২৬. কৃষিজ রূপান্তর, দরিদ্র জনগোষ্ঠি ও কৃষি উপকরণ, কৃষি নীতিপত্র বাংলাদেশ, উন্নয়ন অন্বেষণ, ২০০৯
২৭.http://www.badc.gov.bd/site/page/1643c1ee-3ea5-4485-8202-40139a094a47/%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8
২৮. http://www.kalerkantho.com/home/printnews/240705/2015-07-03
২৯. http://www.kalerkantho.com/home/printnews/23916/2010-01-16
৩০. বায়োকলোনিয়ালিজম এবং খাদ্য রাজনীতিঃ টার্গেট বাংলাদেশ, জোবায়রে আল মাহমুদ, বিবিধ, মে ২০১৪
৩১. দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৭
৩২. আসন্ন বাজেট ও কৃষি খাত, ড. জাহাঙ্গীর আলম, ২৫ মে, ২০১৭
৩৩. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০১৭
৩৪. তিতুমীর ও সারোয়ার, ২০০৬